প্রথম বোধোদয়
গ্রন্থমালা সংস্করণ
৮ আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীবনমালী আশ
সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
শ্রীকানাইলাল বসাক
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী



এক

দু-শো বছর আগে আমাদের এই বাংলাতেই একজন লোক জন্মেছিলেন, যাঁকে দেখে সবাই ছি! ছি! করত, পারলে গায়ে থু থু দিত। এমন ছেলে, যে মা-বাপ যখন তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স মোটে ষোল বছর। পরে বাপ যদি বা ক্ষমা করলেন, মা কিছুতেই না। সারা জীবন তিনি এই কুলাঙ্গার সন্তানের সর্বনাশ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নামে মিথ্যা মামলা খাড়া করে, বাপের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

যাঁর মা-ই এমন, গ্রামের লোক যে তাঁর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে সে তো বোঝাই যায়। আর শুধু অশিক্ষিত গ্রামের লোক কেন —যারা খেতে পায় না সে বেচারিরা কি না বুঝে—এই কলকাতা শহর যাকে চিরকাল সবাই শিক্ষার ও সংস্কৃতির লালন-ভূমি বলে জেনে এসেছে এখানকার শিক্ষিত বাবুরাও নানা রকম অসভ্য গান বেঁধে ভাড়া করা লোক দিয়ে সুর করে রাজধানীর পথে পথে গাওয়াতেন; গুণ্ডার ভয় দেখাতেন; ডোম দিয়ে তাঁর দেবালয়ে গোরুর হাড় ফেলাতেন আর কাগজে-কলমে ও সভাগৃহে তাঁর নামে মন-গড়া যাচ্ছে-তাই নিন্দা রটাতেন।

তবু কেউ তাঁকে তাঁর নির্বাচিত পথ থেকে এক চুল নাড়াতে পারেনি।

মা তাঁর হৃদয়ে কতখানি আঘাত করেছিলেন তার হিসেব পাওয়া যায় না, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি করতে পারেন নি।

সেই লোকটির নাম রামমোহন রায়।

পৃথিবীর সব দেশেই মাঝে মাঝে এমন একেকটা দুঃসময় আসে যখন মনে হয় এ-দেশ রসাতলে যেতে বসেছে, এর আর কোনো আশা নেই ঠিক সেই সময় একেকজন মহা-পুরুষ এগিয়ে এসে, কোনো দৈব শক্তি দিয়ে৷ নয়, নিজের বুদ্ধিবলে আর মনুষ্যত্বের জোরে দেশটাকে সর্বনাশের জলাভূমি থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু দেশের লোকে প্রাণপণে তাঁর বিরোধিত করে, এমনি হতভাগ্য তারা।

রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কোনো দেশ যখন আত্ম-বিস্মৃত হয়ে আপন মহত্বকে অস্বীকার করে, তখন একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলে, তাকে বুঝতে বা স্বীকৃতি দিতে সময় লাগে…(রামমোহন) ছিলেন সেই মানুষ, যাঁর জন্য দীর্ঘ রাত্রি ধরে দেশের ইতিহাস অপেক্ষা করেছে, যে-মানুষের নিজের জীবনে আত্মার সম্পূর্ণ মর্ম এবং স্বদেশের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে।……সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার তমসাচ্ছন্ন যুগে যখন দেশবাসী তাঁকে চিনতে পারেনি, সেই যুগে রামমোহন এমন এক উন্নত মানের অর্ঘ্য তাঁর দেশবাসীদের জন্য বহন করে আনলেন, যার উদার সহানুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার মিলন ঘটেছিল।"

এক কথায় বলতে গেলে এ-দেশের লোকের কাছে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিদ্যার দরজাটি খুলে দিয়ে রামমোহন চিরকালের মতো আধুনিক জগতে তাদের জায়গা করে দিয়েছিলেন। ব্যাপক অর্থে তাঁকে আধুনিক ভারতের পিতা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতা হারাবার পর ভারতের জনজীবনের

সমস্ত ক্ষেত্রে যা কিছু উন্নতিশীল উদ্যোগ হয়েছে, একটু ভাবলে দেখা যাবে তার মূলে আছে রামমোহনের আদর্শ আর অনুপ্রেরণা। অথচ এই রামমোহনকে তাঁর স্বজাতিরা কি নির্যাতনই না করেছিল।

রাজা তিনি কোনো কালেই ছিলেন না। 'রাজা' উপাধিটি তিনি শেষ বয়সে একজন স্বার্থান্বেষী নবাবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তার চেয়ে তাঁর অনেক বড় পদ ছিল। রামমোহন ছিলেন ভারতীয় পৌরুষের প্রতিমূর্তি। তিনি সর্বনাশের হাত থেকে স্বদেশবাসীদের বাঁচিয়ে ছিলেন। চেষ্টা করে কেউ কখনো মহা-পুরুষ হতে পারে না। কতকগুলি গুণ নিয়ে জন্মাতে হয় আর সেই গুণগুলোকে কাজে লাগাবার জন্য সুযোগ করে নিতে হয়, আপ্রাণ খাটতে হয়। অনেক সময়-ই দেখা যায় যে ছোটবেলায় লোকে অতটা লক্ষ্য না করলেও, কিছুদিন পরেই সেই অসাধারণত্বটা ঐ মানুষটির সব কাজে আর কথায় ফুটে বেরোতে থাকে।

আগেই বলেছি সময়টা ছিল খারাপ। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের ২২ তারিখে, হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে, এক গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহন জন্মেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রিটিশরা এ দেশে রাজত্ব কায়েমের সুযোগ পায়। তারা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু ভারতের নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে।

ব্রিটিশরা আধুনিক শিক্ষিত জাত; তারা পথ-ঘাট, সাঁকো, কুঠি বাড়ি তৈরি করে নিল, নিজেদের ব্যবসার সুবিধের জন্যে। কিছু দিশী লোকের সাহায্য ছাড়া ব্যবসা চলে না, তাই অল্প কয়েকজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে, চাকরি দিয়ে, নিজেদের কাজ গুছিয়েছিল। তারা ব্যবসাদার

ছিল ; পয়সা করতেই এসেছিল, পয়সা করে চলে যেত ; এদেশে কেউ থাকতে আসেনি। দেশটা ভালো-মন্দে তাদের কি?

আরেক দলও এসেছিলেন, তাঁরা ধর্ম-প্রচারক। যত বেশি লোক খ্রীশ্চান ধর্ম নেবে, তাঁদের তত পুণ্য হবে, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। যে-কারণেই হক, এঁদের জন্য বঙ্গদেশের অনেক উপকার হয়েছিল। মূর্খ দেশবাসীদের আধুনিক লেখা-পড়া শেখাতে এঁরা ছিলেন অগ্রণী। তবে হিন্দুদের আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করা এঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু খেতে-পরতে পাবে, লিখতে-পড়তে, কাজ করতে শিখবে, গরীবের পক্ষে সে-ই যথেষ্ট। এমন একটা সময়-ও এসেছিল যখন দলে দলে হিন্দু খ্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম ছাপাখানা বসানো, প্রথম বাংলা বই ছাপানো, সে-ও এঁদেরি কৃতিত্ব। এঁদের কাছে আমরা গভীর ভাবে ঋণী।

এরি মধ্যে রামমোহন জন্মালেন। তাঁর বাবার নাম ছিল রামকান্ত, মায়ের নাম তারিণীদেবী। রামমোহনের একজন বড় ভাই ছিলেন, জগন্মোহন আর সবার বড় এক দিদি ছিলেন। জগন্মোহন বেশি দিন বাঁচেননি।

রামকান্ত গোঁড়া হলেও, তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি আর বিদ্যানুরাগ ছিল। রামমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে, তিনি ঠিক করলেন এই ছেলেটিকে যতদূর সম্ভব লেখা-পড়া শেখাবেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলেকে খুব বেশি লেখা-পড়া শেখালে তার যে স্বাধীন মতামত গড়ে উঠবে, আর সে যে বাপ-মায়ের কথা মতো না-ও চলতে পারে, এ-কথা বাপের কেন মনে হয়নি, সেটা বোঝা শক্ত। কার্যত দেখা গেল, একদিন এই ছেলে সমস্ত ভারতীয় চিন্তাধারার নিয়ম পাল্টে দিল।

খুব ছোটবেলা থেকেই ছেলের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছিল। একটা গল্প শোনা যায় যে পাঠশালায় ভর্তি হবার পর, রামকান্ত রোজ ছেলেকে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। পথে একজনদের বাড়ি পড়ত। সেখানে একটি দেব-মূর্তি ছিল। রোজ রামকান্ত বলতেন, "ভগবান। নমো কর।" আর রামমোহন নমস্কার করতেন।

একদিন নাকি দেখেন মূর্তির পায়ের কাছে গর্ত। কি ব্যাপার? না, ইঁদুরে খুবলে গর্ত করেছে। রামমোহনের চক্ষুস্থির। ভগবানের পায়ে কখনো ইঁদুরে গর্ত করতে পারে? এ তাহলে কি রকম ভগবান? সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিজেরি অজান্তে মনের বিশ্বাসে হয়তো একটু নাড়া লেগে গেছিল। পরে এই ছেলে মূর্তি-পূজার বিরোধী হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

রামকান্ত হয়তো ব্যাপারটা ততটা লক্ষ্য করেননি। পাঠশালায় রামমোহনের মতো মেধাবী ছাত্র আর ছিল না। সে-কালের রাজভাষা ছিল পারস্য। ইংরিজির বদলে শিক্ষিত লোক পারস্য ভাষা রপ্ত করতেন। রামমোহন বাংলা, সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য ভাষাও ভালো করে শিখলেন।

ছেলের নয় বছর বয়স হলেই, রামকান্ত তাকে আরবি শিখতে পাটনায় পাঠালেন। সেখানে রামমোহন তিন বছর ধরে ইস্‌লামী বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। মুসলমানরা জাত মানেন না আর নিরাকার ভগবানের উপাসনা করেন। এ যেন রামমোহনের মনের মতো কথা।

কোরান পড়লেন ; ইউক্লিডে রজ্যামিতি আর অ্যারিস্টটলের ন্যায়-শাস্ত্রের আরবি অনুবাদ পড়লেন। এর ফল যা হবার তা হল। ঐ বারো বছর বয়সেই মন থেকে সব গোঁড়ামি ঘুচে গেল। যুক্তির সামনে যা দাঁড়াতে পারে না. তিনি তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

পাটনা থেকে ফিরতেই রামকান্ত ছেলেকে কাশী পাঠালেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়ে আসুক। চার বছর ছিলেন সেখানে রামমোহন। হিন্দু-শাস্ত্রের আর কিছু পড়তে বাকি রাখলেন না। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে সব ধর্মের এক-ই শিক্ষা। ভগবানে ভক্তি আর জীবে দয়া। তবে আবার এত হানাহানি কিসের ?

ষোল বছর বয়সে বিদ্যা সাঙ্গ করে ছেলে বাড়ি ফিরেই, এক কাণ্ড করে বসলেন। পৌত্তলিক উপাসনা বিষয়ে এক পুস্তিকা লিখলেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে বেদান্তে আর চণ্ডীতে নিরাকারের উপাসনার কথা আছে। নিরাকারের পূজায় অ-হিন্দু কিছু নেই। রামমোহন কোনো সময়ে নিজেকে অ-হিন্দু ভাবতেন না।

কিন্তু হলে হবে কি ? এমন একটি গোঁড়া পরিবারের ছেলে হয়ে এমন পুস্তিকা লিখলে সমাজের সামনে আত্মীয়স্বজনের মাথা হেঁট হয়। তাঁরা বেজায় রেগে গেলেন।

বুদ্ধিমান রামকান্তর চেয়ে, অল্পশিক্ষিত তারিণী দেবীই বেশি রেগে গেলেন। দিলেন ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। যে ছেলেকে জন্ম দিয়ে তাঁর নারী-জীবন সার্থক হয়েছিল, তাকে বাড়ির বার না করে মা ছাড়লেন না। তবে ছেলেও কিছু কম যান না। যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, তাকে কখনো ছাড়া যায় ? চলে গেলেন বাড়ি থেকে।

বলা বাহুল্য আত্মীয়স্বজনরা কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। তবে তিনি যে একেবারে বন্ধুহীন ছিলেন এমন-ও নয়। গ্রামের মধ্যে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ছিলেন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি তন্ত্র সাধনা করতেন। এঁর কাছেই রামমোহন একেশ্বর-বাদের স্তোত্র 'ওঁ নমস্তে সতে......' ইত্যাদি শিখেছিলেন। বাড়ি ছেড়ে এঁর কাছেই যে রামমোহন সহানুভূতি আর পরামর্শের জন্য যাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

শোনা যায় নন্দকুমার-ই সেই ষোল বছরের অসাধারণ ছেলেকে একলা, পায়ে হেঁটে দুর্গম তিব্বত যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

বলা যায় যে এই সময় চিরকালের মতো রামমোহনের নাবালোকত্ব ঘুচে গেছিল।

দুই

ষোল বছর বয়সে রামমোহন তো তিব্বত চলে গেলেন। হয়তো শুনেছিলেন সেখানকার গুম্ফাগুলোতে অনেক পুরনো বৌদ্ধ পুঁথি আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। জ্ঞান-পিপাসা ঐ বয়সেই তাঁর যথেষ্ট ছিল। তবে এ-সব লোকদের মধ্যে অজানাকে জানবার ইচ্ছাও খুব প্রবল হয়; হয়তো নতুন দেশ দেখবার জন্যেও গিয়ে থাকতে পারেন। ভয়-ডর বলে তো কিছু ছিল না।

সে সময় আমাদের দেশ আর তিব্বতের মধ্যে দুই জাতের লোক নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-ই দেশ দেখতে যেতেন না। এক যেতেন সাধু-ভক্তরা তীর্থ করতে। হিন্দুদের যেমন, তেমন বৌদ্ধদের কাছেও তিব্বত ছিল বড়ই পবিত্র জায়গা। সেখানে মানস সরোবরের তীরে অনেক-গুলি বৌদ্ধ মঠ ছিল। হিন্দুরা তো আবহমান কাল থেকে কৈলাস আর মানস-সরোবরের স্বপ্ন দেখতেন।

এ ছাড়া যেতেন ব্যবসায়ীরা। ছোট ছোট টাট্টু-ঘোড়ার আর খচ্চরের পিঠে ভারতের জিনিস তিব্বতে আর তিব্বতের জিনিস ভারতে

তাঁরা বেচা-কেনা করতেন। পথে বড় বিপদ। শুধু যে তুষারপাত, ধ্বস, বুনো জন্তুর ভয়, তা নয়; তার চেয়েও বড় ভয়ানক ছিল ঘোড়সোয়ার দস্যুরা। সামান্য কটা জিনিসের লোভে তারা ছোটখাটো নিরস্ত্র দলকে দল মেরে কেটে সাবাড় করে দিত। ব্যবসায়ীরা তাই বড় বড় দল বেঁধে, অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা নিয়ে যেতো। আর যদি কোন সাধু-সন্ত তীর্থযাত্রীকে সঙ্গী পেতেন, তবে তো কথাই নেই। দেবতার আশ্রয়ে যাওয়ার মতো নিরাপদ কি আছে?

যদিও রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায়নি, যতদূর মনে হয়, এই রকম কোনো ব্যবসায়ীদের দলের সঙ্গে তিনি গেছিলেন। এবং নিরাপদেই পৌঁছেছিলেন। ঐ বয়সেই তাঁর মুখে ও আচরণে এমন একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল যে তাঁকে দেখবামাত্র লোকের শ্রদ্ধা হত। সন্ন্যাসীর মতো দেখতে এই উজ্জ্বল ছেলেটিকে দেখে যে লামাদের ভালো লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ছেলেমানুষ হলেও, লামারা আর পুরোহিতরা তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনায় বসতেন। তাঁদের পুঁথিপত্র পড়বার যথেষ্ট সুযোগ-ও দিয়েছিলেন। তাতেই হল মুশকিল। এই বিদগ্ধ, স্বাধীনচেতা যুবক ছিলেন ভারি স্পষ্টবক্তা। শেষের দিকে তাঁর কথায় পুরোহিতরা এতই রুষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টায় ছিলেন। বাঁচিয়েছিলেন তিব্বতের মহিলারা। তাঁরাই তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন; তারপর দেশে ফিরে আসবার নিরাপদ পথ-ও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এ-কথা রামমোহন কখনও ভোলেননি। সারাজীবন ধরে তিনি যখনি নারীদের উপকার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু সমাজের মেয়েরা যা কিছু অধিকার পেয়েছে তার সব কিছুর মূলেই রামমোহন।

এ তো গেল পরের কথা। চার বছর বিদেশে ভ্রমণ করে, শেষে তিনি দেশে ফিরে এলেন। তখন তাঁর কুড়ি বছর বয়স। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। এদিকে রামকান্ত তাঁর সবচেয়ে আদরের, সব চেয়ে গর্বের ছেলেটিকে হারিয়ে, অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছিলেন। যেই তাঁর কানে এল রামমোহন তিব্বত থেকে ফিরে এসেছেন, অমনি লোক পাঠিয়ে তাঁকে কাছে নিয়ে এলেন।

রামমোহনও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন। মহাপুরুষদের মনে ক্ষোভ, অভিমানের জায়গা থাকে না। তা ছাড়া কর্তব্যের দিকটাও ছিল। রামমোহনের বয়স যখন মাত্র নয় তখনি রামকান্ত কুলীনদের যেমন নিয়ম ছিল, পর পর তার দুটি বিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহন জানতেন এঁদের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর কর্তব্য।

কিন্তু বাড়িতে টেকা দায় হল। তিনি যে উন্নত চিন্তার স্বাদ পেয়েছিলেন, তার কাছে বাড়ির অতিরিক্ত গোঁড়ামি অসহ্য হয়ে উঠল। রামমোহন আলাদা হলেন। এবার কিন্তু বাপের সঙ্গে মতভেদ হয়ে চলে যাওয়া নয়। বুদ্ধিমান রামকান্ত বুঝলেন যে আলাদা থাকাই সংসারের পক্ষে ভালো। তিনি বিষয়-আশয় ভাগ করে দিলেন। নিজের জন্যেও একটি অংশ রাখলেন। রামমোহন পেলেন জোড়াসাঁকোর একটি বাড়ি আর দেশে কিছু জমি। তাছাড়া তাঁর দাদামশাই তাঁকে কিছু নগদ টাকা দিলেন। ১৭৯৬ সাল। চব্বিশ বছর বয়সে রামমোহন সাংসারিক দিক থেকে স্বাধীন হলেন। রামমোহনের প্রথম স্ত্রীর দুটি ছেলে হয়েছিল, রাধাপ্রসাদ আর রমাপ্রসাদ। ছোট-বউ নিঃসন্তান ছিলেন। এঁদের সুখ-সুবিধা দেখা রামমোহনের কর্তব্য। কিন্তু মহাপুরুষরা শুধু সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে আসেন

না। সংসার তাঁদের মনে সব চেয়ে প্রাধান্য পায় না। রামমোহন স্থির করেছিলেন টাকা রোজগার করে, এই মস্ত পরিবারের সারা জীবনের সংস্থান করে দিয়ে, তারপর বাকী জীবনটা দেশ-সেবায় কাটাবেন। আজকাল যেমন দেশ-সেবা বলতে রাজনীতি বোঝায়, সে-কালে কথাটির অনেক বড় মানে ছিল।

বিষয়-আশয়কে প্রাধান্য না দিলেও, অসাধারণ মেধা ছিল রামমোহনের। যাতে হাত দিতেন, সেটাই সফল হত। রামমোহন তাঁর কলকাতার বাড়িতে থেকে কোম্পানির কাগজ বিক্রি আর তেজারতির ব্যবসা করে অনেক রোজগার করলেন। সেই টাকা দিয়ে কলকাতায় আর কলকাতার বাইরে অনেকগুলো বাড়ি, তালুক ইত্যাদি কিনে ফেলতে পারলেন। এ-সব থেকে তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট আয় হত।

মানুষটি বিদ্যানুরাগী। ইংরিজি না শিখলে দেশের লোকের যথেষ্ট উপকার করা যাবে না। শাসকরা দেশী ভাষা জানেন না; এদিকে এ-দেশে কোথাও ইংরিজি শেখানোর সে-রকম ব্যবস্থা নেই। একমাত্র উপায় ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তায় চাকরি নেওয়া। উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা সবাই ইংরেজ; তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে হলে, ইংরিজি শিখবার একটা সুযোগ হয়ে যাবেই। যদিও দেশী লোকরা তখন কেরাণীর পদ-ই পেতেন, মাইনে ভালোই ছিল।

রামমোহন ১৮০০ সালে বানারস গিয়ে সাহেবদের কুঠির কর্তা র‍্যাম্‌সেকে ধরলেন। ইনি এক সময় রামমোহনের কাছে টাকা ধার করেছিলেন; সেই সূত্রে আলাপ ছিল। র‍্যাম্‌সে তাঁর চাকরির ব্যবস্থা

করে দিলেন। বানারসে কাজ করার পর ১৮০৩ সালে ফরিদপুরে রামমোহন উডফোর্ড সাহেবের অধীনে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন। এ-দেশী লোকেরা এর চেয়ে উঁচু পদ পেতেন না।

রামমোহনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তিনি ভালো করে ইংরিজি শিখেছিলেন। ফরিদপুর থেকে তিনি মুর্শিদাবাদে বদলি হলেন। সেখানে থাকার সময় আরবি ও ফারসিতে তাঁর প্রথম চিন্তাশীল রচনা 'তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুয়াহিদ্দিন' প্রকাশিত হল।

বইয়ের বিষয়-বস্তু ছিল পৌত্তলিকতার অসারতা আর একেশ্বরবাদের যৌক্তিকতা। হিন্দুরা যে খুসি হননি, সে তো জানা কথা।

বইটি বেরোবার কিছুদিন আগে রামমোহনের বাবা রামকান্ত মারা গিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। বাপ মারা যাবার সময় রামমোহন কাছেই ছিলেন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের বাড়িতে যে নিয়মে শ্রাদ্ধ হয়, রামমোহন সে নিয়ম পালন করেননি। তাতে তারিণী দেবী খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। যেমন করে হোক ছেলেকে একটা কঠিন শিক্ষা দেবেন বলে তিনি স্থির করেছিলেন। পরে সে চেষ্টাও করেছিলেন।

চাকরিতে রামমোহনের ক্রমাগত উন্নতি হয়েছিল আর কয়েক বছরের মধ্যে এতখানি ইংরিজি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন যে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের কিছু নির্বাচিত অংশের সুন্দর ইংরিজি অনুবাদ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের অনেক পণ্ডিত লোক পড়ে খুব খুসি হয়েছিলেন।

চাকরিতে উন্নতি করাই তাঁর কাম্য ছিল না। ১৮১৫ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে, তাঁর জীবনের আসল কাজের জন্য, নিজেকে তৈরি

করতে লাগলেন। অবিশ্যি, এক দিক দিয়ে এখন পর্যন্ত তাঁর জীবনের সব শিক্ষা, সব অভিজ্ঞতাই এই আসল কাজের প্রস্তুতি বই তো নয়।

রামমোহনের বয়স তখন বেয়াল্লিশ বছর। এই বয়সে সরকারি চাকুরেরা অবসর নেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। রামমোহন তখন জীবনের আসল কাজ আরম্ভ করার স্বপ্নে বিভোর।

তিন

সাংসারিক কর্তব্যগুলো সম্পন্ন করে তবে অনেকটা মুক্ত পুরুষ হয়ে নিজের কাজ করা যায়। রামমোহন দেখলেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে দেশে রাখা যায় না। লোকে বড় উপদ্রব করে। মুরগির ডাক ডাকে, গোবুর ছাড় ফেলে। তাঁর নিজের তাতে কিছু এসে যেত না। তাছাড়া দুষ্কৃতকারীরা যখন সেটা লক্ষ্য করল, অত্যাচারগুলো থেমেও গেল।

গোল বেধেছিল বড় ছেলে রাধাপ্রসাদের বিয়ের সময়। নিজেদের গ্রামে কিম্বা চেনাশোনার মধ্যে তার বিয়ে হল না। লোকে বলতে লাগল. রামমোহন ঠাকুর-দেবতা মানে না, ওর বাড়িতে মেয়ে দিলে জাত যাবে। ফলে শাপে বর হল। হুগলীর এক ভালো ঘরের মেয়ের সঙ্গে রাধা-প্রসাদের বিয়ে হল।

কিন্তু ঐ গ্রামের বসবাস যে তুলে দিতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। রামমোহন অত সহজে পেছপাও হবার মানুষ ছিলেন না। রঘুনাথপুরে বাড়ি তৈরি করে, পরিবারের সকলকে সেখানে নিরাপদে রেখে, কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতাই ছিল সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। সমাজের কাজ করতে হলে, কলকাতায় থাকতে হবে। যতদূর মনে হয়, এই সময় সার-

কুলার রোডে একটা বাড়ি তৈরি করে, রামমোহন তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

কি ভাবে কাজ শুরু হল ? না, নিজের বাড়িতে 'আত্মীয় সভা' বলে একটা ছোট সভার প্রতিষ্ঠান করলেন। ভারতের আধুনিক চিন্তার প্রথম কুঁড়ি।

আধুনিক চিন্তার মানেই স্বাধীন চিন্তা। রাজনীতির ক্ষেত্রে উঠে দাঁড়িয়ে বিদেশী সরকারের কাছে স্বাধীনতা দাবি করার চিন্তা নয়। এক দিন সেই রকম দাবি যাতে কার্যে পরিণত হয়, এমন সব দেশবাসী তৈরী করা। এখনো তো দেশে গুটি-কতক ছাড়া কোনো মানুষের মতো মানুষই ছিল না। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে, রামমোহন ছিলেন ভারতের প্রথম দেশ প্রেমিক। সমাজ বিদ্‌রা বলেন, দেশবাসীরা কবে একটা জাতি হয়ে ওঠে ? না, যখনি তাদের চৈতন্য হয় যে তারা একটা জাতি, তখনি তারা জাতি হয়ে ওঠে। কিন্তু সে চৈতন্য হওয়া বড় সহজ কাজ নয়।

আগে নিজেদের দোষ-দুর্বলতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান হবে, তবে তো সেগুলো শুধরোবার চেষ্টা করবে। মুশকিল হল অধিকাংশ মানুষকে এ জ্ঞান দিতে গেলে তারা চটে যায়। কাজেই গোড়ায় তাদের মূর্খতা, কু-শিক্ষা, কু সংস্কার দূর করতে হয়। আসল হিন্দু ধর্মটা যে কি আর পুরুষানুক্রমে সেটা কিসে দাঁড়িয়েছে, শুধু এক দল লোকের লোকের কারণে, —আগেই তাহলে সেইটে দেখাতে হয়।

কিন্তু এ-সব করতে গেলে দু-এক দিনে হবে না, দু-এক ক্ষেত্রেও হবে না। একটা সামগ্রিক উন্নয়ন দরকার হবে। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে,

স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে, দারিদ্র্য মোচন করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, বই ছাপতে হবে, স্কুল আর পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ-সব কাজে যে রামমোহনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা, অর্থ, উচ্চ পদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সমস্তই নিয়োগ করতে হয়েছিল সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর মনে লোভ ছিল না, অহঙ্কার ছিল না, অভিমান ছিল না, ভয় ছিল না। তাই কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

রামমোহন বেদান্তের বাংলা করতে আরম্ভ করলেন। তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "শাস্ত্র ও যুক্তির পথ অনুসরণ করেই আমরা এই পৃথিবীতে ও পরবর্তী জীবনে পূর্ণ তৃপ্তি পাব।" অর্থাৎ শুধু শাস্ত্র-বচন আওড়ালেই হবে না—তাও বেশীর ভাগ মানে না বুঝে—বচনগুলোকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

এখন মুশকিল হল, দেশের লোক ধর্ম বলতে শুধু খানিকটা ক্রিয়া-কলাপ আর পুরুত-ঠাকুরের কথার পুনরাবৃত্তি বুঝত। মন্ত্রের মানে বোঝাবেটা কে? পুরুত ঠাকুর নিজেই কি আর সব বুঝতেন? যজমানি তাঁর পেশা, এই করেই তাঁর সংসার চলে। মূর্খকে জ্ঞান দেওয়া কাজ নয়। আর জানলে তো দেবেন।

ধর্ম নিয়ে নতুন কিছু বলতে গেলেই লোকে বলে অ-ধার্মিক। রামমোহনকে বলত ধর্মত্যাগী। অথচ তিনি তাদের পরম শাস্ত্র বোঝাবার চেষ্টা করতেন। যিনি নিজেকে কোনো দিনও অ-হিন্দু ভাবেননি, তিনি অন্যদের অ-হিন্দু করতে চাইবেন কেন? আজ পর্যন্ত অনেক লোকে ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু-ধর্ম বিদ্বেষী বলে মনে করে, অথচ ব্রাহ্ম-ধর্মের মূল মন্ত্রগুলো উপনিষৎ থেকে নেওয়া। আসল বিরোধ ছিল একে-

ধারে সামাজিক। রামমোহন গোঁড়ামি দূর করতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন; মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বেদের নির্দিষ্ট পথে উপাসনার প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন।

আচার-নিয়ম অন্ধভাবে মেনে চলা তিনি পছন্দ করতেন না। ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন কেন? দুঃখের বিষয়, যাঁরা তাঁর উপদেশ মেনে চলতে লাগলেন, গোঁড়া হিন্দুরা তাঁদের একঘরে করল। ভয়ের চোটে কেউ কেউ রামমোহনকে ছেড়ে চলে গেলেন। যে ক-জন রইলেন, তাঁরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরলেন আর পরে একটা অন্য মানে উদার সমাজে পরিণত হলেন। এই হল ব্রাহ্ম সমাজের গোড়ার কথা।

ধর্মকথা বলতে গিয়ে রামমোহন ঐ উপনিষদের কথাই বলতেন। উপনিষদে আছে ভগবানকে জানতে হলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সব কিছুকে কাজে লাগাতে হবে। সর্বদা যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হবে। জ্ঞানই হল একমাত্র উপায়।

শুধু তত্ত্ব-কথা বলেই রামমোহন ছাড়েননি, সেই সঙ্গে তাঁর মতো বাস্তব কর্মী এ-দেশে কম দেখা গেছে। এই রকম অবস্থার মধ্যে ১৮১৫ সালে, আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের কোনো কথাই তখনো ওঠেনি। রামমোহনের একমাত্র ইচ্ছা হিন্দু-সমাজটাকে বিশ হাত কাদা থেকে টেনে তুলতে হবে।

এই সভায় নানা ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। রামমোহন চাইতেন মুসলমান, খ্রীশ্চান ভক্তরাও আসুন। নানান ধর্ম শাস্ত্র থেকে পাঠ হত। গান হত; রামমোহন চমৎকার গান রচনা করতেন। অনেক জ্ঞানী-গুণী

হিন্দুও আসতেন। নিরাকার একেশ্বরবাদীদের মতেই সব হত। গোঁড়ারা গেলেন চটে। এ-সভা বন্ধ করতেই হবে। তখন তাঁরা আর কোনো উপায় না দেখে, রটিয়ে দিলেন এরা গো-হত্যা করে, নিষিদ্ধ মাংস খায় ইত্যাদি। সদস্যরা একে একে সরে পড়লেন। আত্মীয়-সভা বন্ধ হল।

বিরোধিতায় রামমোহন দুর্বল না হয়ে, আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তাঁর মতো পুরুষ-সিংহকে দমিয়ে রাখা কোনো মানুষের সাধ্য ছিল না। ভয় কাকে বলে জানেন না। অপমান গায়ে লাগে না। মানুষটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

নিজের মত প্রচার করবার জন্য রামমোহন নিজের খরচে ইংরিজিতে ও বাংলায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। সেগুলি শাসকমহলেও বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। চমৎকার ভাষায় লেখা এ-সব, পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। বিরোধীরাও বসে থাকতেন না, এই সব পুস্তিকার মতামতের বিরুদ্ধে কড়া কড়া—কখনো বা অভদ্র—জবাব লিখে তাঁরাও সেগুলি ছেপে বের করতে লাগলেন। এ সব লেখা-লেখির ভাষা খুব সহজ না হলে সাধারণ লোক বুঝতে পারবে না, তাই এই তর্কা-তর্কির মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা অনেকখানি সরল হয়ে এল। শাপে বর হল।

রামমোহনের পুস্তিকাদি ছাপা হত খ্রীশ্চান মিশনারিদের ছাপাখানায়। তাঁরাও নিরাকার একেশ্বরের উপাসক বলে গোড়ায় তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের সদ্ভাব থাকলেও, তিনি যখন খ্রীশ্চান ভগবানের ত্রি-রূপের বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, মিশনারিরা রাগ করে তাঁর কাগজ ছাপা বন্ধ করে দিলেন। রামমোহন নিজে একটি ছোট প্রেস্ কিনে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তা না হয় হল, কিন্তু নিরাকার একেশ্বরবাদীদের মিলিত হবার তো একটা জায়গা দরকার। প্রথমে খ্রীশ্চান একেশ্বরবাদীদের উপাসনা-গৃহে সকলে যেতেন, পরে ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট (৬ই ভাদ্র), চিৎপুর রোডে একটা বাড়ি ভাড়া করে 'ব্রহ্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা হল। শনিবার সভা হত। বেদ উপনিষদ্ থেকে পাঠ আর ব্যাখ্যা হত। গান হত অন্য নিরাকার একেশ্বরবাদীরাও কেউ কেউ আসতেন।

দু-বছর বাদে চাঁদা তুলে, জোড়া সাঁকোয় জমি কিনে, বাড়ি করে, ১৮৩০ সালের জানুয়ারিতে (১১ই মাঘ) প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করা হল।

নতুন মন্দিরেও সবাই সপ্তাহে এক দিন মিলিত হতেন। আনুষ্ঠানিক আচার-নিয়মের বালাই ছিল না। তবে অন্য ধর্মের কি কোনো ব্যক্তির নিন্দা আর সভাগৃহে কোনো ছবি বা মূর্তি আনা বারণ ছিল।

আজকাল কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "রামমোহন রায় কে ছিলেন?" সাধারণত সে বলে, "ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।"

এটুকু পরিচয় দিলে কিন্তু কিছুই বলা হয় না। যদিও রামমোহনের অনুপ্রেরণার ফলেই ঘটনাক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেইটেই তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না আর তার চেয়েও তাঁর অনেক বড় পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের জনক তবে তাঁর ভক্ত ব্রাহ্মরাই যে কয়েকজন হিন্দু জ্ঞানী-গুণীদের সহযোগিতায়, এ-দেশের মাটিতে প্রথমে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। না হলে সে সময়ে আরো অনেক উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত হিন্দুরা খ্রীশ্চান সমাজের দিকে আকৃষ্ট হতেন।

এইভাবে রামমোহন যে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন, আধুনিক ভারতীয় চিন্তা তার ফলস্বরূপ। আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবনে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিফলিত হয়েছে। মেয়েদের অবস্থার উন্নয়ন; আধুনিক শিক্ষার প্রসার; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ; তাছাড়া ভাষার, সঙ্গীতের, সাংবাদিকতার, এমন কি বই প্রকাশনের ক্ষেত্রে, যেদিকে তাকানো যায়, তাঁর কল্যাণ-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

চার

রামমোহন রায় মানুষটা কেমন দেখতে ছিলেন ? তাঁর একটাই ছবি সাধারণত দেখা যায়, তাতে মাথা থেকে কাঁধ অবধি আছে। মাথায় বাঁধা পাগড়ি। গায়ে নকশা-করা শাল। দেখতে নাকি ভারি সুপুরুষ ছিলেন। ফরসা রং, মাথায় খুব লম্বা, মাথাটিও বেশ বড়, বলিষ্ঠ গড়ন। আর সমস্ত শরীর থেকে এমন একটা তেজ বেরোত যে দেখলেই শ্রদ্ধা হত।

ছোটবেলা থেকে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন সে-কথা তো বলাই হয়েছে। বিষয়-আশয়ের ওপর লোভ ছিল না, কিন্তু তাই বলে কিছু সন্ন্যাসীও ছিলেন না। গরীব-দুঃখীদের আর শিক্ষা-বিস্তারের কাজে মুক্ত হস্তে দান করতেন।

এদিকে নিজের সাংসারিক কর্তব্য সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি দেশ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন বলে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার যাতে কষ্টে না পড়ে, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল।

প্রকাণ্ড জোরালো চেহারাটিও যেমন ছিল—সম্ভবত ব্যায়াম করতেন—খেতেও পারতেন তেমনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাড়ি গিয়ে

দেখে এসেছিলেন তিনি সরষের তেল দিয়ে শরীর দলাই-মলাই করিয়ে, আরবি ফারসি শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে দোতলা থেকে নেমে এসে, ঝপাং করে এক টব জলে ঝাঁপ দিলেন তারপর ঘন্টাখানেক ধরে স্নান চলল।

নাকি রোজ বারো সের দুধ খেতেন। একটা ছোট খাটো পাঁঠা একাই খেতে পারতেন। একবার নাকি নিজেই কাকে বলেছিলেন যে ৫০টা আম খেয়ে জলযোগ করে এসেছেন।

মনের জোর-ও কিছু কম ছিল না। সেই ষোল বছর বয়সে মা-বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারপর মাথার ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছিল, কত ভাবনা-চিন্তা, অপমান-অত্যাচার, মিথ্যা নিন্দা। তবু তিনি তাঁর বেছে নেওয়া পথ থেকে এক চুল নড়েননি পুরুষ-সিংহ আর কাকে বলে।

তারপর কতখানি মনের জোর প্রয়োগ করে চাকরি করতে করতে সাহেব কর্মচারিদের সঙ্গে মিশে ইংরিজি ভাষা রপ্ত করেছিলেন, সে কথা ভাবলে মানুষটির ধৈর্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

যেমন নিজের ওপর আস্থা, তেমনি ভগবানে বিশ্বাস। অতি প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও কখনো ভেঙে পড়তেন না। একবার কয়েকজন বন্ধু একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেরাই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। এখন রামমোহন তাঁর কর্তব্য করে যান, কখনো কোনো দুর্বলতার চিহ্ন দেখা যায় না। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থির করলেন দেখতে হবে মানুষটা কি ধাতু দিয়ে তৈরি।

রামমোহনের বড় ছেলে রাধাপ্রসাদ কোনো কাজে কৃষ্ণনগরে

গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বন্ধুরা একজন লোকের হাতে রামমোহনকে একটা জাল চিঠি পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল যে কৃষ্ণনগরে ওলাউঠা হয়ে রাধাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে।

চিঠি পেয়ে রামমোহন কি করেন দেখবার জন্য তাঁরা চিঠি পৌঁছবার আগেই তাঁর বাড়ি গিয়ে নানান্ কাজের কথা পেড়েছিলেন। এর মধ্যে চিঠি এল। চিঠি খুলে পড়ে, মুহূর্তের জন্য রামমোহনের সুন্দর মুখ কালি হয়ে গেল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, চিঠিটি তুলে রেখে তিনি আবার কাজে মন দিলেন। তখন বন্ধুদের মনে নিদারুণ অনুতাপ হল। এ কি জঘন্য নিষ্ঠুর খেলা! তাঁরা রামমোহনের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। আর রামমোহন তখনি তাঁদের ক্ষমা করলেন।

নিন্দা বা মন্দ কথা তাঁর গায়ে লাগত না। একবার একজন শত্রু তাঁর নামে অশ্লীল গান লিখে, ভাড়া করা লোক দিয়ে পথে পথে গাইয়েছিল। তাই শুনে তাঁর ভাগ্নে মহা রেগে, সেই গানের রচয়িতাকে বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম দেবার জোগাড় করেছিলেন। রামমোহন নিজে গিয়ে তাঁকে বারণ করলেন। বললেন ধৈর্যের মতো কিছু নেই।

মাঝে মাঝে বেশ মজার মজার ঘটনাও ঘটত। রামমোহনের কলকাতার বাড়িতে সুন্দর বাগান ছিল। সেখানে একটা আমগাছের ডালে একটা দোলনা বাঁধা ছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে তাতে দুলত। তিনি নিজেও ওদের সঙ্গে দুলতেন। মাঝে মাঝে শোনা যেত রামমোহন ছেলেগুলোকে বলছেন, "এতক্ষণ তোমরা দুললে, আমি দোল দিলাম। এবার আমার পালা, তোমরা দোল দাও।" বন্ধুরা তো শুনে অবাক!

একবার একজন পণ্ডিত মানুষ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা, আপনি ও-ভাবে ছেলেপেলেদের সঙ্গে দোলনায় চড়েন, সেটা কি ভালো দেখায় ?"

তার উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন, "বিলেতে যাবার ইচ্ছে আছে কি না, তাই দোল খাওয়া অভ্যাস করছি। শুনেছি ঢেউয়ের মাথায় জাহাজ দোল খায় আর সকলের গা-বমি করে। অভ্যাস থাকলে তা করবে না।"

মাঝে মাঝে ঠাট্টার ছলে মিষ্টি মিষ্টি শিক্ষাও দিতেন। বাগানে সবার অবাধ গতি ছিল। একজন বামুন পুরুত রোজ ফুল তুলে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি গায়ের চাদরখানি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ফুল তুলছিলেন। চাকরদের কেউ চাদরটা দেখে, তুলে রাখে।

ফুল তোলা হলে বামুন চাদর না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। রামমোহন তাই দেখে তাঁকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে। তারপর একটুক্ষণ শাস্ত্রালোচনা করে, চাকরকে বললেন, চাদরটা এনে দিতে।

বামুনকে চাদর ফেরত দিয়ে রামমোহন বললেন, "এবার খুসি হয়েছেন তো ?"

বামুন বললেন, "নিজের চাদর ফিরে পেয়েছি, তাতে খুসি হবার কি আছে ?"

রামমোহন বললেন, "ঐ যে ফুলগুলো দেবতাকে দেবেন বলে নিয়ে যাচ্ছেন, ওগুলো পেয়ে দেবতা খুসি হবেন তো ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"আচ্ছা ওগুলো কি আপনি বানিয়েছেন, না কে বানিয়েছে ?"

"কেন, ভগবান বানিয়েছেন।"

"তাহলে তাঁর জিনিস তাঁকে দিলে, তিনিই বা খুসি হবেন কেন ?"

বামুন পুরুত তখন ভারি লজ্জা পেলেন।

বন্ধুবান্ধবরা অনেক সময় নানা সাংসারিক বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে আসতেন। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির ওপর সকলেরি শ্রদ্ধা ছিল।

একবার টাকির জমিদার একটা শাঁখ নিয়ে এলেন। কে একজন লোক শাঁখটি বিক্রির জন্য তাঁর কাছে এনেছিল। ওর দাম নাকি ৫০০ টাকা। যে-সে শাঁখ নয়। সেই লোকটি জমিদারবাবুকে বলেছিল, "এ শাঁখ যার বাড়িতে থাকবে, লক্ষ্মী ঠাকরুণ-ও তার বাড়িতে অচলা হয়ে থাকবেন। তাই শাঁখের এত দাম।"

রামমোহন বললেন, "মালক্ষ্মী কি এতই সস্তা যে ৫০০ টাকার বদলে ও লোকটা তাঁকে হাতছাড়া করতে চাইছে?" এ-কথা শুনে জমিদার মশাই-ও ভাবলেন, তাই তো, তা তো হতে পারে না। বাড়ি গিয়ে তিনি শাঁখটি সেই লোককে ফেরত দিলেন।

পাঁচ

বাংলার মেয়েদের উন্নতির ইতিহাস বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। তার পিছনেও রামমোহনের অনুপ্রেরণা ছিল। সারা জীবন যখনি যে ভাবে পেরেছিলেন মেয়েদের দুঃখ খানিকটা দূর করার চেষ্টা করতেন। অনেকের মতে সেই যে যৌবনে তিব্বতের মেয়েদের দয়া পেয়েছিলেন, সে-কথা তিনি কখনো ভোলেননি।

নিজের দেশের মেয়েদের অবস্থা সে-সময় বাড়ির গোরু-ছাগলের চেয়েও খারাপ ছিল। তাদের কাছ থেকে দুধ পাওয়া যাবে বলে তারা যেটুকু যত্ন পেত, মেয়েরা তা-ও পেত না। কোনো শিক্ষা, সম্মান, বা অধিকার-ও তাদের ছিল না। অন্য কোনো ধর্মের মেয়েরা এতখানি বঞ্চিত ছিল না। মুসলমান মেয়েরাও শিক্ষা পেত না, কিন্তু বাপের আর স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ছিল। স্বামী মারা গেলে, কিম্বা স্ত্রীকে ত্যাগ করলে, সে মেয়ের আবার বিয়ে হতে পারত। শোনা যায় নবাবদের আমলে, তাঁরাও হিন্দু মেয়েদের এই দুর্দশা দেখে দুঃখিত হতেন। কিন্তু পাছে হিন্দু সমাজের লোকেরা চটে যায়, তাই তাঁরা কিছু করেননি।

ব্রিটিশরাও প্রথমে এ-সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। হিন্দু সমাজ কি ভাবে ব্যাপারটা নেবে এই ভয়ে তাঁরা চুপ করেই ছিলেন। রামমোহন তাঁদের সাহস যোগালেন।

সে সময়ে আট বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াকে লোকে পুণ্যকাজ বলে মনে করত। তাদের স্বামীরা যদি অকালে মারা যেত, কচি কচি মেয়েগুলো বিধবা হত। তখন তাদের অবস্থা ঝি-চাকরেরা অধম হত। অনেক সময়ে স্বামীর চিতায়, বিধবাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। তাকে সতী হওয়া বলত।

রামমোহন যৌবনে এই রকম একটা বীভৎস দৃশ্য দেখেছিলেন। তাঁর নিজের বড় ভাই মারা গেলে, তাঁর এক পত্নী তাঁর চিতায় পুড়ে মরেছিলেন। রামমোহন কোথায় যেন গিয়েছিলেন। ফিরে এসেই সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য তাঁকে দেখতে হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি মনে মনে সংকল্প করেছিলেন হিন্দু-সমাজের এ কলঙ্ক যেমন করে হক, তিনি ঘোচাবেন।

এ কাজ তিনি একা করেননি। এমন কি কাজটা তিনি-ই প্রথম শুরুও করেননি। ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেস্লি ছিলেন লাট সাহেব। সে সময়ে এল্‌ফিনস্টোন বলে একজন ইংরেজ প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। ওয়েলেস্লি তার ফলে পণ্ডিতদের সাহায্যে অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন হিন্দু ধর্মে বিধবাদের জন্য অন্য ব্যবস্থাও আছে। অধিকাংশ সময়ে বিধবাদের স্ত্রী-ধন কি অন্য সম্পত্তির লোভে, নিকট আত্মীয়রাই তাদের সতী হবার ব্যবস্থা করত।

হিন্দু আইন মতে বিধবার গর্ভে যদি সন্তান থাকে, কিম্বা সে যদি দু-তিনটি সন্তানের মা হয়ে থাকে, কিম্বা বারো বছরের কম বয়স হয়,

তাহলে তার সতী হবার দরকার নেই। কিন্তু তখনি কোনো নতুন আইন প্রবর্তিত হয়নি। ১৮১৮ সালে রামমোহন এই কাজ হাতে নিলেন।

প্রথমে কয়েকটি ছোট ছোট বই প্রকাশ করলেন। তার সাহায্যে সতী-দাহের নিষ্ঠুরতা আর অযৌক্তিকতা জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। বিরোধীরা অবশ্য খুবই আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই নিবন্ধের খানিকটা ইংরিজিতে প্রকাশিত হওয়াতে, ইংরেজ সরকার ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। কথাটা লণ্ডনের পার্লামেন্ট অবধি পৌঁছেছিল।

তখনকার লাট সাহেব উইলিয়ম বেন্টিংক রামমোহনকে ডেকে এ বিষয়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করেছিলেন। সম্ভবত তার-ই ফলে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইন করে বেন্টিংক সতী-দাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এ-ই সব নয়। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ১২৫ বছর পরে, এখনকার ভারতীয় মেয়েরা যে পুরুষদের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, সামাজিক আর রাজনৈতিক অধিকার আর সব চেয়ে যেটা বেদনা-দায়ক হয়ে দেখা দিয়ে থাকে, সেই সম্পত্তির অধিকার পেয়েছে, তার-ও প্রথম বীজটি পুঁতেছিলেন রামমোহন, যদিও তিনি তার ফল দেখে যেতে পারেননি।

সেকালের হিন্দু মেয়েরা যদি তাদের স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণ থেকে বঞ্চিত হত, তাহলে তাদের বড়ই দুরবস্থা হত। স্বামীর সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না, বাপের সম্পত্তিতেও না। এদিকে লেখা-পড়াও তাদের শেখানো হত না যে নিজেরা রোজগার করে খাবে। ভদ্র ঘরের মেয়েরা থাকত তো পরদার আড়ালে। সত্যি কথা বলতে

গেলে ধোপা নাপিত চাষীদের মেয়েদের অনেক অভাব থাকলেও, কাজ করবার অধিকার-ও ছিল।

রামমোহন মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজকে সচেতন করবার কাজ আরম্ভ করলেন। বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন এ বিষয়ে, নানান্ জায়গায় আবেদন-পত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে বাংলায় প্রচলিত দায়-ভাগ নিয়মের ভুল ব্যাখ্যার ফলেই মেয়েদের বাপের বা স্বামীর সম্পত্তিতে সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেই সময় থেকে অল্পে অল্পে তিলে তিলে মেয়েদের ন্যায্য অধিকারগুলো ক্রমে স্বীকৃতি পেয়ে আজ আর পুরুষদের সঙ্গে প্রায় কোনো তফাৎ-ই নেই।

তখনকার সাধারণ ঘরের পুরুষদের-ও কম দুর্দশা ছিল না। সে দুর্দশার মূলে ছিল মূর্খতা। লেখা-পড়া শেখানোর যে-ব্যবস্থা দুশো বছর আগেও প্রচলিত ছিল, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। তারপর দেশের ও সমাজের আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয়ে গেছিল, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তার এতটুকু ছায়া পড়েনি। কলেজ দূরের কথা, স্কুল পর্যন্ত ছিল না।

ছিল গ্রামে গ্রামে টোল। সে সব টোলে লিকলিকে বেতের সাহায্যে হতভাগ্য পড়ুয়াদের সংস্কৃত শেখানো হত। বাংলা ব্যাকরণ তখনো লেখাই হয়নি। বাংলা সাহিত্য তখনো প্রায় অস্ফুট। তাহলে ছেলেরা টোলে গিয়ে পড়ত কি? পড়ত সংস্কৃত। শ্লোক মুখস্থ করত। তার ব্যাখ্যা শুনত। পণ্ডিত ভালো হলে ভালো কথা আর পণ্ডিত নিজেই যদি অর্ধ-শিক্ষিত হত, তাহলে সে যে কি শেখাত সে তো

অনুমান-ই করা যায়। মোট কথা সংসারের কাজে লাগা এমন কোনো বিদ্যা শেখাবার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না।

ছেলেরা বাপের পেশা ধরত, কিম্বা বাপের জমানো টাকা খরচ করত; খানিকটা বিচক্ষণ হলে সুদে খাটাত। বাইরে থেকে কিছু শিখে আসার উপায় ছিল না, এক ধর্মশাস্ত্র ছাড়া। ফলে ক্রমে ক্রমে লোকের দারিদ্র্য বেড়েই যেত। তার উপর স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম কেউ জানত না। পাস্ করা ডাক্তার ছিল না। ডাক্তারি শেখাবার কোনো প্রতিষ্ঠান-ও ছিল না। আয়ুর্বেদ পড়া কবিরাজ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অতি দক্ষ কবিরাজও ছিলেন। মুসলমান হাকিমরা ছিলেন। আর ছিল ভূত তাড়াবার ওঝা, ঠাকুরের চরণামৃত, দেবতার থানে গিয়ে মানত করা ইত্যাদি। তার উপর কু-সংস্কারে ভরা ছিল লোকের মন।

রামমোহন কিশোর বয়স থেকেই বাংলার বাইরে ঘুরেছিলেন। অন্য দেশের ভাষা শিখেছিলেন। রাশি রাশি বই পড়েছিলেন। তারপর নিজের চেষ্টায় ইংরেজিও শিখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসরবান পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁর হাতে এসে গেছিল। তিনি মনে মনে সংকল্প করেছিলেন, দেশের এই শোচনীয় অ-শিক্ষা আর কুসংস্কার ঘুচিয়ে না দিলে এ জাতের উদ্ধারের কোনো পথ নেই। তিনি দেখতেন সব দিক দিয়ে এ-দেশের হিন্দুরা অনেকখানি পেছিয়ে আছে।

তারা তাদের গৌরবময় অতীত নিয়ে যতই অহংকার করুক, মুসলমানরা তাদের চেয়ে সামাজিক ভাবে অনেক বেশি উদার। তারা জাত মানে না, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে, মসজিদে সকলেই প্রবেশ করতে পায়। তাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহকে নিন্দনীয় মনে করা হত না,

মেয়েরা বাপের সম্পত্তির ভাগ পেত; সে ভাগ ভাইদের অর্ধেক হলেও তারা একেবারে বঞ্চিত হত না। খ্রীশ্চান সমাজ আরো আধুনিক, আরো আলোকপ্রাপ্ত, তাঁরা হিন্দু-মুসলমানদের মতো পরদা-প্রথা মেনে চলতেন না। তঁদের অনাথ-আশ্রমের ছেলে-মেয়েরাও লেখা-পড়া, কাজ-কর্ম শিখত, যাতে করে পরে তারা আত্মসম্মানের সঙ্গে অন্ন-সংস্থান করতে পারত। তাদের পদে পদে জাত যাবার ভয় ছিল না।

হিন্দুদের মধ্যেও যে আগে এ-সব ছিল না সে-কথা বার বার লিখে আর বলেও রামমোহন তাঁর হিন্দু দেশবাসীদের বিশ্বাস করাতে পারেননি। বিশ্বাস করবার মতো উদার মনোভাবই তাদের ছিল না। উদার মনোভাব হবে কোত্থেকে, সব যে আকাট মুখ্যু। এদের ইউরোপের শিক্ষায় খানিকটা দিতে না পারলে কিছুই হবে না। আগেও যেমন টোলের পণ্ডিতের কাছে খানিকটা দুর্বোধ্য এবং প্রায়ই অশুদ্ধ সংস্কৃত শিখে, এতটুকুও মূর্খতা ঘুচত না, এখনো সেই নিয়মই চলে আসছিল। শিক্ষা মানেই পাঠশালায় বেত খেয়ে অ-আ লিখতে পারা।

সব চেয়ে মজার কথা হল যে এ-দেশের গোঁড়া লোকদের ইউরোপীয় নিয়মে শিক্ষিত করে তোলার দরকারটা বুঝেও, ব্রিটিশ সরকার বিলিতী নিয়মে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। দেশের লোকরা যদি ক্ষেপে যায়, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু একটা কিছু যে করতেই হবে, তা-ও তাঁরা ভালো করেই বুঝতেন।

১৮২২-২৩ সালে শোনা গেল এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানি ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা খরচ করবেন। কিন্তু রামমোহন শুনে হতাশ হলেন যে ঐ টাকায় কয়েকটি আধুনিক নিয়মের স্কুল না খুলে,

আরো সংস্কৃত বিদ্যালয়ই খোলা হবে। বলা বাহুল্য এতে গোঁড়ারা খুব খুশি।

শেষ পর্যন্ত ১৮২৩ সালে রামমোহন লাট সাহেব অ্যামহার্স্টকে একটি চমৎকার চিঠি লিখলেন ইংরিজিতে। তাতে খোলাখুলি লিখলেন যে একটা দু-তিন হাজার বছরের পুরনো, অকেজো শিক্ষা-পদ্ধতির জন্যে এত টাকা খরচ করার কোনো মানে হয় না। শিক্ষা-বিস্তার-ই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিলিতী নিয়মের স্কুল খোলা হোক। ছেলেরা—মেয়েদের কথা সে কালে উঠতই না—কিছু কাজের মতো কাজ শিখুক। দুঃখের বিষয় তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থার অধিকর্তা চিঠিটা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন—'এটার উত্তর দেবার কোনো দরকার নেই।' অথচ ঐ টাকাতেই বিলেত থেকে শিক্ষক এনে, এখানকার শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেত। তবে এটুকু বলতেই হবে যে মিশনারিরা কোম্পানি বাহাদুরের মর্জির জন্যে অপেক্ষা করেননি, নিজেরা যেমন ভালো বুঝেছিলেন, সেইভাবে কিছু কিছু শিক্ষা বিস্তার ও খ্রীশ্চান ধর্ম প্রচার করে চলেছিলেন।

কোম্পানি বাহাদুরের ঔদাসীন্যের জন্যে রামমোহনের কাজ বন্ধ হয়নি। শিক্ষার অধিকর্তা ছাড়াও শিক্ষানুরাগী অন্য লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ডেভিড্ হেয়ার। তিনি নিজে যে খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন তা নয়, তাঁর ঘড়ির ব্যবসা ছিল। পেশা যাই হোক, নেশা ছিল শিক্ষা বিস্তার। এঁকে না পেলে রামমোহন কতখানি সফল হতেন বলা শক্ত।

একবার কোনো আলোচনা সভায় রামমোহন কুসংস্কার দূর করার কথা

বলেছিলেন। সেই সভায় রবাহুত ভাবে ডেভিড হেয়ার এসেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে এ-দেশে শিক্ষার বিস্তার হলে কুসংস্কার আপনিই দূর হয়ে যাবে, কারণ সাধারণ লোকের চোখ ফুটে যাবে। এ ঠিক রামমোহনের মনের মতো কথা। শিক্ষা বিস্তারের কথা বলতে তাঁরা উভয়েই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

ঐ সভায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এই কথার সমর্থন করেছিলেন। পরে ডেভিড হেয়ার বিচারপতি স্যার হাইড ঈস্টের কাছে একটি আধুনিক বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেছিলেন। এই বিষয়ে একটি মিটিং ডাকা হয়। প্রস্তাবটি তখনি গৃহীত হয়েছিল, অনেকেই চাঁদা দিতে আগ্রহী হলেন। এর ফলে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম 'হিন্দু কলেজ'। এখন লোক তাকে হেয়ার স্কুল বলে জানে।

এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল। যদিও রামমোহন ছিলেন প্রধান উদ্যোগী, খাতায় তাঁর নাম ছিল না। তাঁর নাম থাকলে পাছে গোঁড়া পরিবারের ছেলেরা স্কুলে ভরতি না হয়, এই ভয়ে তিনি কমিটিতে নিজের নাম দেননি। এর পর আধুনিক শিক্ষাকে আর ফিরে দেখতে হয়নি।

এ ছাড়াও নিজের খরচে রামমোহন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটি স্কুল খুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ এক সময় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো হত।

আরো কত বিদ্যালয়কে তিনি অর্থ আর উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তার ঠিক নেই। ভারতে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিনির্ভর আধুনিক বিদ্যালয়ের এই ভাবে গোড়াপত্তন হয়েছিল, প্রধানতঃ রামমোহনের চেষ্টায়।

ছয়

এই যে মানুষটির নানা ক্ষেত্রে কাজের কথা হচ্ছে, এঁকেই বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। অথচ সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনো দিন-ই ছিলেন না। তবে ভাষা তো আর সাহিত্যিকদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। একেকটা দেশে ক-জনই বা সাহিত্যিক জন্মায় আর তাদের মধ্যে ক-জনই বা ধোপে টেকে। আসলে ভাষা হল মনের চিন্তার আদান-প্রদানের বাহন। কাজেই সে যতই সহজ, সরল, অন্তরঙ্গ হয়, ততই ভালো।

সে-কালের সাহিত্যের বেশির ভাগই লেখা হত কাব্যে। গদ্য যে একেবারেই ছিল না, তাও নয়। কিন্তু সে বড় খট-মট সংস্কৃত-ঘেঁষা গদ্য; দাঁড়ি ছাড়া তাতে কোনো যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। আমরা যে আজকাল কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতি-চিহ্ন, জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করি, তার পেছনেও রামমোহনের হাত ছিল।

ব্যাপারটা বেশ মজার। সমাজ সংস্কারের কাজ ভারি ব্যাপক। যে-সব ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার, তার বিষয়ে জন-সাধারণকে সচেতন করতে হয়। এ কাজ খুব সহজ নয়। সে-কালে তো আর বাংলা খবরের কাগজের চল ছিল না। রামমোহন একটা সহজ উপায় ধরলেন, পুস্তিকা

ছেপে, বিলি করা। ঐ সব পুস্তিকার প্রবন্ধগুলির ভাষা খটমট হলেও বিষয়-বস্তুগুলি চমৎকার। কিন্তু রামমোহন অল্প দিনেই বুঝেছিলেন, অশিক্ষিত জন-সাধারণ কঠিন ভাষার মানেই বুঝবে না, আর মানে না বুঝলে পুস্তিকা প্রকাশ করাই বৃথা। কাজেই তিনি ক্রমে ভাষাকে সহজ করে আনলেন।

বিরোধী পক্ষই বা ছেড়ে কথা বলবে কেন। রামমোহনের সব পুস্তিকার যুক্তির পাল্টা উত্তর দিতে লাগলেন তাঁরা। আর সেই একই কারণে তাঁরাও সহজ, সরল ভাষা ব্যবহার করতে লাগলেন। নইলে লোকে বুঝবে না। এইভাবে যুক্তি-তর্কের উপযুক্ত একটা বোধগম্য বাংলার প্রচলন শুরু হল। তাতে যতি চিহ্ন থাকলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়। কাজেই রামমোহন বাংলা গদ্যে যতি-চিহ্ন ব্যবহার করতেন। রামমোহনের আগে থেকেই খ্রীশ্চান মিশনারিরা তাঁদের ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্য বাংলা গদ্য লিখতে, ছাপতে ও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের কাছে বাংলা ভাষা গভীর ভাবে ঋণী, যদিও সে ভাষাতে অনেক ত্রুটি ছিল। তাঁদের কাজ খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করা। যাদের মধ্যে তাঁরা কাজ করতেন তাদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত, গরীব আর খুব উঁচু জাতের নয়। তারা বুঝতে পারবে এমন ভাষার দরকার। বাইবেলের অনুবাদ হবে, ধর্মযাজকদের বাণী প্রচার হবে। সে-সবই লোকের বুঝতে পারা চাই। কাজেই এ-দিক দিয়ে রামমোহনের আর এঁদের সমস্যা ছিল এক-ই।

মিশনারিরা আরেকটি ভালো কাজ করেছিলেন, সে-কথা আগেও বলা হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার অগ্রণী ছিলেন তাঁরাই।

আগে বাংলার আলাদা ব্যাকরণ ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়াবার জন্য পণ্ডিত রাখা হত। এখন যুক্তিবাদী ইংরেজরা জানতেন যে-কোনো উন্নত ভাষার একটা ব্যাকরণ থাকা দরকার। তাছাড়া ব্যাকরণ হাতে থাকলে সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখার কিঞ্চিৎ সুবিধাও হয়। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লেখা হল ১৭৭৮ সালে। রচয়িতার নাম হ্যালহেড। তিনি ইংরিজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। পরে আরো বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল, তাও ইংরিজিতে।

রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৩ সালে, যে-বছর তিনি দেহ রাখেন। বিলেত যাবার আগে, ব্যাকরণটি প্রণয়ন করে, প্রকাশককে দিয়ে গেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাকরণ বাঙালী ছাত্রদের জন্য বাংলায় লেখা।

চমৎকার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ; ১১টি অধ্যায়; ৬৪টি বিষয়, ব্যাকরণের উদ্দেশ্য থেকে ছন্দ পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। তবু বলতেই হয় বইটি বেশ জটিল।

প্রথম বাংলা গদ্যের বই অবিশ্যি রামমোহনের লেখা নয়। ১৮০১ সালে রামরাম বসু একখানি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। ১৮০২ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসনের গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির ভাষা বড় বেশি সংস্কৃত-ঘেঁষা। রামমোহনের প্রথম বাংলা গদ্যের বই হল বাংলায় বেদান্ত। ১৮১৫ সালে। এর ভূমিকাতে কেমন করে বাংলা গদ্য পড়তে হয়, তা-ও লেখা আছে আর বাংলা গদ্য রচনার নিয়ম। এর থেকেই বোঝা যায়, তার আগে বাংলা গদ্যের খুব বেশি চর্চা ছিল না।

কোনো বইকে যখন আমরা সহজ বা শক্ত বলি, আজকের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করেই বলি। রামমোহনের লেখাকে তাই খটমট মনে হয়। সেকালে এই ভাষা পড়েই পণ্ডিতরা রুষ্ট হতেন। আবার এর অনেক পরে যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বেরিয়ে ছিল, তখনকার পণ্ডিতরাও রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। অথচ আজকালকার পাঠকদের মতে বিদ্যাসাগরের বাংলা বড় শক্ত।

সে যাই হোক, বাংলা গদ্যের জনক রামমোহন তাঁর স্বদেশ বাসীদের হাতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা তুলে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল ক্রমাগত সহজ হবার সম্ভাবনা। এ-কাজ যদি তিনি করে না যেতেন, পর পর বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এমন সম্ভাবনা-ময় তৈরি সামগ্রী পেতেন না, যার সাহায্যে মর্ত্যে স্বর্গ রচনা করা তাঁদের সাধ্য হয়েছিল।

সাত

জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত করে দেখতে গেলে তার একটা সামগ্রিক চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব মিলিয়ে দেখলে তবে একটা জাতির আসল চেহারা বোঝা যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় এর দু-একটাতে কোনো জাতি অনেকখানি এগিয়ে থাকলেও, অন্য দু-একটাতে পেছিয়ে পড়েছে। এই পেছিয়ে পড়াটা অনেক পুরুষ ধরে চললে তার মর্মান্তিক ফল হয়। উনিশ শতকে আমাদের দেশের সামাজিক জীবনে সেই ফল-ই দেখা দিয়েছিল।

অনেক সময় এ-ও দেখা যায় যে জন-সাধারণের জীবনের এই নানা দিক এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে একটির উন্নতি কিম্বা অবনতির প্রভাব অন্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। রামমোহন যেই শিক্ষার আর সামাজিক জীবনের কিছুটা উন্নতি ঘটালেন, সমস্ত জাতীয় জীবনের চেহারাটাই সেই থেকে আস্তে আস্তে বদলাতে আরম্ভ করল। তার কারণ তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের কিছু সংখ্যককে নিজেদের জাতীয় জীবনের নানান অধিকার আর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁরা দেশটাকে আরো উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

যেমন ধরা যাক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। মনে রাখতে হবে সেকালে ভদ্রঘরের মেয়েরা বাইরে বেরোতেন না, বড়জোর চিকের আড়াল থেকে নাচ-গান দেখতেন। সামাজিক জীবন থেকে তাঁরা একবারে বাদ পড়তেন। আমোদ-প্রমোদ বলতে পুরুষদের আমোদ-প্রমোদই বোঝাত। তাতে পেশাদার নাচিয়ে-গাইয়েদের স্থান ছিল। কালে নানা রকম দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল। যখন রামমোহনের প্রিয় বন্ধু ও ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও তাঁর পরিবারের এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আরো অনেকের চেষ্টায় মেয়েদের সামাজিক অধিকার স্বীকৃতি পেল, তখন থেকে আস্তে আস্তে এবং অতিশয় স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্র থেকে অনেক কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার লোপ পেতে লাগল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা গেল, নিজেদের নাগরিক ও জাতীয় অধিকার সম্পর্কে রামমোহন-ই প্রথমে তাঁর শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের সচেতন করে দেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই, আগে হাজার শিক্ষিত হলেও বাঙালী সরকারি কর্মীরা বড় জোর উচ্চ-পদস্থ কেরাণী হতেন। রামমোহনের চেষ্টায় হাইকোর্টের জজদের সঙ্গে একজন করে এ-দেশী জজ নিয়োজিত হতে লাগলেন, তাতে আর কিছু না হোক, বাদী আর বিবাদী পক্ষের বক্তব্যগুলো নির্ভুলভাবে ইংরিজিতে অনুবাদ হয়ে ব্রিটিশ জজদের বোধগম্য হত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রায় সব রকম উচ্চ পদে সুযোগ্য দেশবাসীদের অধিকার বর্তেছিল। এর-ই পরিণামে এখন ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারের তুলনায়, সব চেয়ে অগ্রসরবান দেশের নাগরিকদের অধিকার-ও বেশি নয়।

রামমোহন নিজেও যথেষ্ট সমাজ সচেতন ছিলেন। জনসমাজে যাওয়া-আসা, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা তিনি ভালবাসতেন। কেবলমাত্র নীরস সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না তিনি। লোকজনকে বাড়িতে ডাকতে, আদর করে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। গান-বাজনা ভালোবাসতেন। তখনো রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজি নজরুল ভবিষ্যতের কোলে। বাংলার দেশী গান-বাজনা বলতে যা চলত, সেটা সব সময় খুব উঁচুদরের ছিল না। তবে উনিশ শতকের গোড়ায় টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮২৮ সালে রামমোহন প্রথম বাংলা ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন। তাঁর ব্রহ্মসভার উপাসনার সময় গাওয়া হবে বলে তিনি নিজে বত্রিশটি ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন। এগুলিতে কীর্তনের ভক্তির দিকটা আছে, কিন্তু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও আবেগের দিকটি নেই। তাঁর পরে বলিষ্ঠ প্রতিভাধারী গুণীজনের সাধনায় বাংলা ধ্রুপদ সংগীত আরো উন্নত মানে পৌঁছেছিল।

সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক দাবি সম্বন্ধে যে কোনো জাতি একবার সচেতন হয়ে উঠলে, জাতীয় জীবনও ক্রমে নানা দিকে প্রসার লাভ করতে থাকে। এই সব নতুন চিন্তাগুলোকে জনসাধারণের সামনে পেশ করতে হলে, কিছু পত্র-পত্রিকার দরকার দেখা যায়। তখনকার দৈনিক সংবাদ-পত্রের সংকীর্ণ পরিসর যথেষ্ট ছিল না। তাতে স্থানীয় ও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী থাকলেও, ঐ-সব ব্যাপারের সমালোচনা ও সে-বিষয়ে দেশবাসীদের মন্তব্য প্রকাশে নানা রকম বাধার সৃষ্টি হত। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের কীর্তিকলাপের সমালোচনাকে সরকার-বিরোধী কাজ বলে মনে করতেন। কাগজ বন্ধ করে দিতে ও সম্পাদককে জেলে পুরতে তাঁরা ইতস্তত করতেন

না। সংবাদপত্রের পরাধীনতা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝে আন্দোলন হয়, শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই। তখনো জন-আন্দোলনের মাটি তৈরি হয়নি; জনগণ তখনো তাঁদের অধিকার কি ও কতখানি তা জানতেন না; রামমোহন-ই এই বিষয়ে অনেকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮২১ সালে তিনি বাংলায় 'সম্বাদ-কৌমুদী' আর ফারশিতে 'মিরাট-উল-আখবর', এই দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। সম্বাদ-কৌমুদীর প্রথম সংখ্যাতেই দুটি প্রবন্ধ ছিল। একটির বিষয়-বস্তু হল জুরির বিচার; অপরটির হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

১৮২৬ সাল থেকে ভারতে জুরির বিচার প্রচলিত হলেও, তার প্রয়োগ ছিল আংশিক। কোন বড় মামলায় কোনো খ্রীশ্চান জড়িত, তার বিচারের জন্য ভারতীয়দের জুরি হতে ডাকা হত না। এই বিষয়ে রামমোহন বিলেতে একটি আবেদন পেশ করেছিলেন, তাতে হিন্দু-মুসলমান অনেক নাগরিকের সই ছিল। ১৮২৯ সালে এই নিয়ে পার্লামেণ্টে আলোচনা হয়েছিল, ১৮৩২ থেকে ভারতীয়রা জুরিতে বসার অধিকার পেয়েছিলেন।

সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার জন্যেও তিনি অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। ১৮২৩ সালের প্রেস্ অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিনা অনুমতিতে কেউ সংবাদ-পত্র প্রকাশ করতে পারত না। এই নিয়ে রামমোহন যথেষ্ট লেখা-লিখি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পরে ১৮৩৫ সালে, মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার আইন পাস্ হয়েছিল। রামমোহন বলে ছিলেন সংবাদপত্র দমন করা মানে জাতীয় চিন্তার উন্নতিতে বাধা দেওয়া। তাছাড়া খবরের কাগজের যে মুখ্য উদ্দেশ্য খবর সরবরাহ করা, সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইংল্যাণ্ডের

কর্তৃপক্ষ সব সময় জানতে পারবেন না এই বিস্তৃত দেশের কোথায় কি হচ্ছে। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের বড় ভয় ছিল যদি তাঁদের ক্ষমতা কমে যায়। লোকে বলে মহাপুরুষরা তাঁদের নিজেদের যুগের মানুষদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকেন। রামমোহনের বেলা এ-কথা খুবই খাটে। ১৮৩১ সালে তিনি ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ট্যালির‍াঁকে লিখেছেন,

"মানবজাতি যে একটি বিশাল পরিবার এবং অগণিত জাতি উপজাতি সেই পরিবারের বিভিন্ন শাখার মতো—এই সত্যের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে সংস্কার-মুক্ত সাধারণ জ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্ভুল সিদ্ধান্ত—ধর্ম নয়।"

একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের পক্ষে সেকালে এমন কথা বলা যে কত সৎ-সাহসের কাজ, সে কথা সহজেই বোঝা যায়।

আট

রামমোহন বিদেশে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে মারা গিয়েছিলেন। তখনো তাঁর অনেক কাজ অসম্পূর্ণ ছিল। সুখের বিষয়, তিনি যে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটি নিবে যায়নি। একে একে তাঁর সব সাধনাই সার্থক হয়েছিল। দেড়-শো বছর আগে তিনি যা যা করতে চেয়েছিলেন, এখন তার প্রায় সব-ই হয়েছে।

মারা যাওয়াটা খানিকটা আকস্মিক-ই বটে। অল্প বয়স থেকেই তাঁর বিলেতে গিয়ে একটা উন্নত সমাজের চেহারা দেখে আসার বাসনা ছিল। ১৮৩০ সালে সে ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

যাবার দুটি কারণ ছিল। সে সময় দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর নামে মাত্র রাজা। আসলে তাঁর সামান্যই অধিকার ছিল। সে অধিকার যখন কোম্পানি বাহাদুর আরো খর্ব করে দিলেন, তখন সম্রাট বিলেতে আবেদন পাঠানো স্থির করলেন। আবেদনের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে তার সুপারিশের ওপর এবং যিনি দৌত্য-কর্ম করবেন, তাঁর ওপর। রামমোহনের মতো যোগ্য পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে। ইংরিজি জানেন। আরবি, ফারসি বিদ্যা অপরিসীম ; ন্যায় বোঝেন। তার ওপর তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। পারলে তিনিই পারবেন। কিন্তু সাধারণ লোক

তো আর সম্রাটের দূত হয়ে যেতে পারে না, কাজেই দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে রাজা খেতাব দিলেন। আসলে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেওয়া ঐ রাজা উপাধিটার কোনো মূল্য নেই। রামমোহন তার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী। তিনি ভারতের প্রথম দেশ-প্রেমিক, যিনি স্বদেশকে অবজ্ঞার চোরাবালি থেকে চুলের মুঠি ধরে তুলে, আত্মসম্মানের শক্ত ডাঙায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বলে রাখি, রামমোহনের চেষ্টায় সম্রাটের আবেদন পুরোপুরি গৃহীত না হলেও, তাঁর ভাতা বছরে দুই লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিলেত যাবার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হল পার্লামেন্টে ভারত সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবার কথা। রামমোহনের বড়ই ইচ্ছা সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকেন। একটি হল সতী-দাহ নিবারণ আইন সম্পর্কে কিছু আলোচনা। বেন্টিংক এই আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

অপর কারণটি হল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের নবীকরণের সময় এসেছিল। নতুন ব্যবস্থায় যাতে ভারতীয়দের কিছু সুবিধা হয়, তার তত্ত্বাবধান করা। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে বহু তর্ক-বিতর্কের পর রিফর্মস্ বিল পাস হয়েছিল এবং রামমোহন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য যতই গুরু-গম্ভীর হোক, রামমোহনের বিলেত যাওয়ার ব্যাপারটিতে কৌতুকের উপাদানও যথেষ্ট ছিল। এই প্রথম একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু-সন্তান বিলেত যাচ্ছেন। তার অনেক ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সঙ্গে গিয়েছিল দু-জন অনুচর, তারা তাঁর দেখাশুনা করত। আর

গিয়েছিল একজন বামুন-ঠাকুর। রামমোহন তো আর জাহাজের রান্নাঘরের যা-তা ছোঁয়া লাগা খাদ্য খেতে পারেন না। তাছাড়া ও-সব সহ্যই বা হবে কেন। আলাদা জায়গায় নিজের রান্নার বন্দোবস্ত হয়েছিল। রোজ দশ-বারো সের দুধ খেতেন, কাজেই একটি দুগ্ধবতী গাভী ও তার বাছুরও গিয়েছিল।

যতই মেধাবী ও বিদ্বান হন না কেন, বিদেশের পথের হাল-চাল দেখিয়ে দেবার একজন লোক সঙ্গে থাকাতে তাঁর সুবিধেই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর নাম জেম্‌স্ সাকার ল্যাণ্ড। তিনি রামমোহনের বন্ধু। সমুদ্রযাত্রার চমৎকার বিবরণী লিখে গিয়েছেন তিনি। তার থেকে রামমোহনের চরিত্রের অন্য একটা দিক-ও দেখা যায়।

ভারি মিশুকে ছিলেন রামমোহন। দুবেলা ডেকে বেড়াতেন, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ইংরিজিতে আলাপ করতেন। তার ওপর তাঁর ঐ সুন্দর, বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। যে দেখত, সে-ই মুগ্ধ হত। চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তখন পর্যন্ত। জাহাজের দোলা খেয়ে আর সব যাত্রীর গা গুলোতে লাগল, সবাই শয্যা নিল; কিন্তু রামমোহনের কিছু হল না। তবে আকস্মিক ভাবে পড়ে গিয়ে একটা পা জখম হয়েছিল। কিছু দিন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। একবার প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। প্রায় সবাই ভয়ে কাতর, রামমোহনের এতটুকু ভাবনা নেই। অবসর সময়ে পড়াশুনো করতেন।

১৮৩১ সালের, এপ্রিলের ৮ তারিখে জাহাজ লিভারপুল পৌঁছল। সেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত রস্কো থাকতেন। তাঁর নিমন্ত্রণে রামমোহন তাঁর বাড়ি গেলেন। পার্লামেন্টের অধিবেশনে উপস্থিত থাকার অনুমতি-পত্র

রস্কো-ই করিয়ে দিয়েছিলেন। যে-সে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভায় যোগ দিতে পারত না।

পথে ম্যাঞ্চেস্টারেও নেমেছিলেন। সেখানকার কাপড়ের কলের দৌলতে ভারতের তাঁত ব্যবসা ডুবতে বসেছিল। রামমোহন সেখানকার শ্রমিকদের সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সকলে বড় খুসি হয়েছিল।

লণ্ডনে তিনি রিজেন্ট স্ট্রীটের এক হোটেলে উঠেছিলেন। তাঁর নানা গুণের কথা ইতিমধ্যে লণ্ডনে পৌঁছেছিল। ইংরেজ জ্ঞানী-গুণী ও রাজপুরুষরা তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে আসতেন। নানা জায়গায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে হত। ও-দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার মান দেখে রামমোহন যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, নিজের দেশের মেয়েদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে তেমনি দুঃখিতও হয়েছিলেন। তখনো কালা আদমিদের প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মায়নি ইংল্যাণ্ডে, যতদূর সম্ভব সৌজন্য ও আদর আপ্যায়ন পেয়েছিলেন তিনি। অবিশ্যি তাঁর মতো মহাপুরুষ হয়তো যে-কালেই হোক, যে-দেশেই হোক, যেখানেই যাবেন সেখানেই সম্মান পাবেন। ভিক্টোরিয়ার কাকার অভিষেক অনুষ্ঠানে শুধু যে রামমোহনের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, তা নয়, তাঁকে আসন দেওয়া হয়েছিল ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ আর গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে।

তার চেয়েও বড় কথা ভারতের অবস্থার উন্নতি-কল্পে তিনি নানান্ প্রকাশ্য সভায় আর পার্লামেন্টের উপসমিতিতে যে-সব তথ্য-বহুল ভাষণ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার ফলে ভারতের জনগণ সম্বন্ধে ও-দেশের শাসক বর্গের আর সাধারণ লোকের অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটেছিল।

কিছু কার্যকরী পরামর্শও দিয়েছিলেন, ভারতীয়দের উচ্চ পদে বহাল করার উপকারিতা সম্বন্ধে। পার্লামেন্টের আলোচনা সভার দেরি থাকাতে ১৮৩২ সালে রামমোহন ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। সেখানে স্বয়ং সম্রাট্ লুই ফিলিপ তাঁকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। তখন ফ্রান্স সবে নেপোলিয়নের শাসন ঝেড়ে ফেলে স্বাধীন দেশ হয়েছে। চারদিকে স্বাধীনতার জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। ঠিক রামমোহনের মনের মতো পরিবেশ। যাবার আগে তিনি ফরাসী ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সব কাজ নিখুঁৎ ছিল।

ইউরোপের অন্যান্য জায়গা থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছিল, যাবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু সময় এবং অর্থ, দুইয়ের-ই অভাব। তাছাড়া এই অনভ্যস্ত আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরের ওপর প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছিল। অসীম ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন।

এদিকে পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় এসে পড়েছিল। রোজ সেখানে যাওয়া চাই। বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। রাজ-পুরুষ ও পণ্ডিতরা ছাড়াও কত যে সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ হয়েছিল তার ঠিক নেই। তাঁদের মধ্যে কার্পেন্টার পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বন্ধুরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে স্থির হল, তাঁকে ব্রিস্টলের কাছে, স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভের নিরিবিলি পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি কুমারী ক্যাসেলের অতিথি হয়ে থাকবেন। পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময়, সেখান থেকে তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে আসা হবে।

সেখানেও বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। মেরি কার্পেন্টারের বাবা ইংল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চের কর্মী ডক্টর জর্জ কার্পেন্টার ব্রিস্টলে থাকতেন। তিনি মাঝে মাঝেই রামমোহনকে সেখানে নিয়ে যেতেন। আরো অনেক পাদ্রী, লেখক, শিক্ষক ইত্যাদি আসতেন।

কেউ বুঝতে পারেননি যে রামমোহনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ তারিখে তিনি ব্রিস্টলের এক বিরাট জন-সভায় তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে, জনগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। পর দিন থেকে জ্বর আর মাথা ব্যথা। সে আর সারল না।

ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা তাঁকে সুস্থ করে তুলবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। কুমারী কার্পেন্টার, কুমারী ক্যাসেল, কুমারী কিডেল, ডেভিড হেয়ারের বোন—সবাই মিলে দিন-রাত তাঁর সেবা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে, রাত দুটো বেজে ২৫ মিনিটে তাঁর জীবন-প্রদীপ নিবে গেল।

বন্ধুরা শোকে মুহ্যমান হলেন আর দেশ থেকে যারা তাঁর সঙ্গে এসেছিল, তাদের মনে হল বুঝি অকূল পাথারে পড়েছে।

রামমোহন যেমন চেয়েছিলেন স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভের কাছেই একটি বাগানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এর বারো বছর পরে রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেত গিয়েছিলেন, তিনি রামমোহনের দেহাবশেষ সেখান থেকে তুলে, আর্নোস্‌ ভেল্‌ নামক সমাধি-ক্ষেত্রে আবার সমাধিস্থ করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর স্বদেশবাসীরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে সেখানে গিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই রকম মানুষ ছিলেন আধুনিক ভারতের পিতা, ভারতের প্রথম দেশ-প্রেমিক রামমোহন রায়।